সমকালীন সমাজবাস্তবতায়

নবি ও নবিপরিবার

মূল : শামিম আলিম

ভাষান্তর : ফরহাদ খান নাঈম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

ভূমিকা

বিগত চৌদ্দশো বছর ধরে নবিজির জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে মুসলিম-অমুসলিম বহু লেখক বই রচনা করেছেন। কিন্তু এগুলোর কোনো একটি তাঁর জীবনকে পূর্ণাঙ্গ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধারণ করতে পেরেছে—এ কথা জোর দিয়ে বলার উপায় নেই। গবেষকগণ যুগ যুগ ধরে তাঁর জীবনের এই অব্যক্ত অধ্যায়গুলো প্রকাশের অক্ষমতা ও শূন্যতা অনুভব করে আসছেন।

নবিজির জীবনীকার হিসেবে নাম লেখাতে পারা নিঃসন্দেহে গৌরবের। তবে তাঁর মতো একজন মহান ব্যক্তির জীবনালেখ্য সার্থকতার সাথে তুলে ধরা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য একটি কাজ। কিছু কিছু লেখক তাঁর জীবনী লিখতে গিয়ে এত বেশি আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছেন, তাতে সিরাত রচনার মূল উদ্দেশ্যই হারিয়ে গেছে। পাশাপাশি তাঁর জীবনপ্রণালি নিয়ে সমালোচনামূলক বইও রচনা করেছেন কেউ কেউ। বিশেষত অমুসলিম গবেষকগণ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে বহু বই ও আর্টিকেল রচনা করেছেন। যদিও মদিনায় একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তাঁর রাজনৈতিক জীবন নিয়ে সমালোচনার পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে। তবু কিছু লেখক জোর করে ধর্মান্তরিত করার অভিযোগ এনেছে তাঁর বিরুদ্ধে। সেইসঙ্গে তাঁর দাসপ্রথা চর্চার অভিযোগও উত্থাপন করেছে তারা। অনেকে আবার প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর বহুবিবাহ নিয়ে। একাধিক স্ত্রী গ্রহণের পেছনে প্রকৃত হেকমত বুঝতে না পেরে ছড়িয়ে দিয়েছে নেতিবাচক চিন্তার বিষবাষ্প।

বিশেষ করে নাইন ইলেভেনের পর ইসলাম ও ইসলামি সাহিত্য নিয়ে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। এটা দেখে অমুসলিমগণ দোটানার মধ্যে পড়ে যায়। একদিকে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে। অন্যদিকে ইসলামবিদ্বেষীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের তকমা লাগিয়ে শুরু করে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার। এই বইতে আমরা নবিজির জীবনীকে একটি গঠনমূলক চিত্রের আলোকে তুলে ধরে বোঝাতে চেয়েছি— ইসলাম সহিংসতার ধর্ম নয়; বরং শান্তিই এর একমাত্র মর্মবাণী। স্বয়ং নবিজির জীবনই তার বাস্তব প্রমাণ।

আমি মূলত ইতিহাস কিংবা ইসলামিক স্টাডিজের ছাত্র নই; পড়াশোনা করেছি সমাজবিজ্ঞান নিয়ে। এই বইতে আমরা মূলত নবিজির পারিবারিক জীবনকে সামাজিক প্রেক্ষাপটের দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করেছি। পদ্ধতি হিসেবে এটি অন্যান্য সিরাত থেকে অনেকাংশেই স্বতন্ত্র। এই বইটি রচনা করতে গিয়ে আমাকে সুন্নাহর গতানুগতিক চর্চার বাইরে গিয়ে আরও গভীরে প্রবেশ করতে হয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে—নবিজির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমাদের গবেষণাকর্মে রয়েছে বহু শূন্যতা। উদাহরণস্বরূপ, নবিজি যদিও কুরাইশ বংশের অন্য শিশুদের মতোই জন্মগ্রহণ

করেছেন, কিন্তু তাঁর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। শুধু তা-ই নয়, তাঁর পিতা আবদুল্লাহর বিবাহ ও দাদা আবদুল মুত্তালিবের বিবাহের তারিখ সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু মাত্র তিন দশক পরে নবিজির নিজের সন্তানের ব্যাপারে তেমন কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর কতজন পুত্রসন্তান ছিল, কার পরে কে এসেছেন এবং তাঁরা কত বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন—এ ব্যাপারে যৎসামান্যই বর্ণনা করা হয়েছে।

নবিজির মাতা আমিনার মৃত্যুর তারিখ ও তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর তারিখের ব্যাপারে ইতিহাসবিদগণ সুনিশ্চিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রিয় স্ত্রী খাদিজা (রা.) ও প্রিয় চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর তারিখ নিয়ে তাদের মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া তাঁর ওপর অবতীর্ণ হওয়া প্রথম ওহির বাণী ও দ্বিতীয় ওহির বাণীর মধ্যকার সময়ের বিরতি কতটুকু ছিল—এ নিয়েও ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। আবার মদিনায় হিজরতের পথে কুবায় তিনি কত দিন অবস্থান করেছিলেন—এ ব্যাপারেও একেকজন লেখক একেক মত প্রকাশ করেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে—নবিজির জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ইলার ঘটনা, যেখানে তিনি তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে এক মাস যাবৎ সাময়িক বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করেন। এ বিষয়েও সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। আবার বিবাহের সময় আয়েশা (রা.)-এর বয়স কত ছিল, তা নিয়েও বিপরীতমুখী মতামত পাওয়া যায়।

এই বিষয়গুলো তুলে ধরতেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এই বই রচনা করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে—যুবক-যুবতিরা যেন নবিজির পারিবারিক জীবন থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে তা প্রয়োগ করার মাধ্যমে নিজেদের পারিবারিক জীবনকে আরও ফলপ্রসূ ও আনন্দময় করে তুলতে পারে।

শামিম আলিম

সূচিপত্র

পর্ব-১

জন্ম থেকে নবুয়ত	১৪
নবুয়ত	২৩
মদিনায় হিজরত	৩৪
যুদ্ধক্ষেত্রে নবিজি	৩৭
নবিজির কর্মপরিকল্পনা	৪৮
নতুন ইসলামি রাষ্ট্র	৫৩
মানবিক সুসম্পর্ক	৫৮
একটি যুগের সমাপ্তি	৬৩
নবিজির ব্যক্তিত্ব	৬৭

পর্ব-২

মক্কায় রাসূল ﷺ-এর পরিবার	৭২
পরিবারের সঙ্গে নবিজি	৭৪
নবিজির বিবাহ নিয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ	৭৭
উম্মাহাতুল মুমিনিন	৮৬
স্বামী হিসেবে নবিজি	৯২

পর্ব-৩

একনজরে নবি ﷺ-এর স্ত্রীগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১০২

নবিজির দাসী ১৫১

পর্ব-৪

রাসূল ﷺ-এর সন্তান এবং নাতি-নাতনি ১৫৬

নবিজির পুত্র সন্তান ১৫৮

নবিজির কন্যা ১৬০

নবিজির নাতি-নাতনি ১৭৩

জন্ম থেকে নবুয়ত

বর্তমান পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম ইসলাম। যদিও ধর্ম হিসেবে ইসলামের পূর্ণতা পাওয়ার ইতিহাস মাত্র চৌদ্দশো বছরের, তবুও এই অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বের প্রতিটি আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে এর সুমহান বার্তা। পৃথিবীর ৫৬টি দেশে এখন মুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সর্বসাকুল্যে সমগ্র বিশ্বে মোট মুসলিমদের সংখ্যা ১.৩ বিলিয়ন। অর্থাৎ পৃথিবীতে মোট জনসংখ্যার প্রতি পাঁচজনে একজন মুসলিম।

প্রাক-ইসলামি যুগে অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল সমগ্র মানবজাতি। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সর্বত্র বিরাজ করছিল জুলুম, অত্যাচার ও সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্য। ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। জোর যার মুল্লুক তার—এই নীতিতেই চলত তৎকালীন সমাজব্যবস্থা। ভীষণভাবে অবদমিত করে রাখা হতো অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের। সমাজে সাম্যনীতির লেশমাত্র ছিল না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে গলা উঁচু করে কথা বলতে পারত না নিপীড়িত-নিষ্পেষিত জনতা। তৎকালীন সামাজিক অবকাঠামো এতটাই ভঙ্গুর ছিল যে, সেখানে নীতিবোধ ও নৈতিকতার কোনো মূল্য ছিল না। পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবগুলোতে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছিল—এহেন অন্ধকার রাজ্যে একজন নতুন নবির আগমন ঘটবে, যিনি বিশ্বমানবতাকে দেখাবেন হিদায়াতের আলো, চেনাবেন সত্যপথের দিশা। তবে কেউই কল্পনা করতে পারেনি, এই মহামানবের আগমন হবে বিশ্বের এক অনুন্নত ও অনগ্রসরমান জনপদ হতে।

তখন আরবের বুকজুড়ে ছিল শুধু ধু-ধু মরুভূমি ও সারি সারি উলঙ্গ পর্বত। শত গোত্রে বিভক্ত ছিল এই জনপদ, আর প্রতিটি গোত্রের ছিল আলাদা গোত্রপতি।

ইসলামের আবির্ভাবকালে এই জনপদগুলোর প্রধান দুটি বংশ ছিল বনু কাহতান ও বনু হাশেম। একই বংশোদ্ভূত গোত্রগুলোর একে অপরের সাথে সম্পর্ক এতটাই মজবুত ছিল, এক গোত্রের বিপদে অপর গোত্র এগিয়ে যেত। নিজ শাখাগোত্র ভুল করলেও তারা তা বিবেচনা না করেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যেত শত্রু-গোত্রের বিরুদ্ধে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল গোত্রগুলো প্রায়শই সাহায্য গ্রহণ করত সবলদের থেকে। আরব গোত্রের পাশাপাশি বেশ কিছুসংখ্যক ইহুদি গোত্রের বসবাস ছিল সেখানে। সমগ্র আরব ভূখণ্ডে যেমন ছিল মরুচারী যাযাবর, তেমনি ছিল স্থানীয় আরব বাসিন্দা।

এই নিদারুণ পরিস্থিতিতে মানবতাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার এক গুরুভার দিয়ে পাঠানো হয়েছিল নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে। তাঁর ওপর অর্পিত এই দায়িত্বের পরিধি কেবল নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এর ব্যাপ্তি ছিল সারা বিশ্বময়।

পবিত্র কুরআনে এসেছে—

'বলো—হে মানুষ! আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল।' সূরা আ'রাফ : ১৫৮

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।' সূরা আম্বিয়া : ১০৭

ঐতিহ্যগতভাবেই মক্কার প্রাণকেন্দ্র কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কুরাইশ বংশের নেতাদের ওপর অর্পিত হয়ে আসছিল। আর এই দায়িত্বের পরম্পরা নির্ধারিত হতো উত্তরাধিকারসূত্রে। প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন কুরাইশ বংশোদ্ভূত, যার পূর্বপুরুষের ধারা ইবরাহিম (আ.)-এর পুত্র ইসমাইল (আ.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। নবিজির দাদা আবদুল মুত্তালিব ছিলেন কুরাইশ বংশের বিখ্যাত হাশিম গোত্রভুক্ত। উদারতা, বিশ্বস্ততা ও প্রজ্ঞার জন্য সকলেই শ্রদ্ধা করত তাঁকে। তিনি ছিলেন কাবা ঘরের তত্ত্বাবধায়ক; তাঁর হাতেই জমজম কূপ পুনরায় অস্তিত্ব লাভ করে। উল্লেখ্য, জুরহুম গোষ্ঠীকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করার পর জমজম কূপের সন্ধান বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবদুল মুত্তালিব যখন একটি কূপ খননের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন, তখন একজন বাদে তাঁর কোনো সন্তানই এ কাজে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেনি। এমতাবস্থায় তিনি অত্যন্ত পীড়িত হয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করলেন—আল্লাহ যদি তাঁকে দশজন পুত্র সন্তান দান করতেন, তবে তিনি তাদের মধ্য থেকে একজনকে কাবা ঘরের জন্য কুরবানি করে দিতেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ করলেন।

একে একে দশজন পুত্র সন্তান দান করলেন তাঁকে। এদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পিতা আবদুল্লাহ। তাঁর এই দশজন সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি আল্লাহকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে গেলেন। কোন সন্তানকে উৎসর্গ করবেন, তা নির্ধারণের জন্য কয়েকবার লটারি টানা হলো। প্রতিবারই নাম উঠে এলো আবদুল্লাহর। তবে একশো উট কুরবানি করার বিনিময়ে বেঁচে গেলেন তিনি।

যুদ্ধক্ষেত্রে নবিজি

মদিনার অধিবাসীগণ নবিজিকে একই সঙ্গে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মেনে নেয়। তিনি সেখানে একটি ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। তবে এ কাজে অনেক বাধা-বিপত্তি পাড়ি দিতে হয়েছিল তাঁকে। তখন প্রধান তিনটি ইহুদি গোত্রের বসবাস ছিল মদিনায়—বনু কায়নুকা, বনু নাজির ও বনু কুরায়জা। নবগঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার্থে অবশ্যই আলাদা বিবেচনায় রাখতে হয়েছিল তাদেরকে। এতে করেই সমস্যা শেষ হয়ে যায়নি; বরং সমস্যার শুরু হয়েছিল। এদিকে ইসলামের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কুরাইশরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়ে। নবগঠিত ইসলামি রাষ্ট্র ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য তারা সব ধরনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করছিল। এযাবৎকাল পর্যন্ত নবিজি তাঁর কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেননি, কিন্তু এবার সূরা হজ নাজিল করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার আদেশ প্রদান করেন—

> ‘যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদের, যাদের আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ, তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের বিজয়দানে সক্ষম।’ সূরা হজ : ৩৯

যদিও মুমিনদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু তখনকার প্রেক্ষাপটে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াটা বাঞ্ছনীয় ছিল না। প্রথমে প্রয়োজন ছিল মক্কামুখী বাণিজ্যিক পথগুলো মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। কারণ, বাণিজ্যিক পথগুলোতে মুসলমানদের ওপর লুটতরাজ চালাত কুরাইশরা। মক্কাবাসীদের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করার জন্য মক্কার বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোকে আটক করাও ছিল সময়ের দাবি। কিন্তু এই কাফেলাগুলো চলাচলের তথ্য সংগ্রহ করা সহজ ছিল না মোটেই। তবে একটি চৌকশ তদন্তদল গঠন করার মাধ্যমে এই কঠিন কাজটি সাধন করেছিলেন নবি করিম ﷺ।

বদর যুদ্ধ, রমজান, দ্বিতীয় হিজরি (মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

একসময় নবিজি জানতে পারলেন, এক বিরাট ব্যবসায়িক কাফেলা নিয়ে মদিনার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছে ইসলামের ঘোরশত্রু আবু সুফিয়ান। এই খবর শুনে নবিজি নিজেই একটি সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন তাকে অবরুদ্ধ করার জন্য। কিন্তু চৌকশ আবু সুফিয়ান নবিজির এই অভিযানের সংবাদ পেয়ে যায়। সে তৎক্ষণাৎ সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠায় মক্কার কুরাইশদের নিকট। নবিজির এই সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য কুরাইশরা ১৩০০ সৈন্যের একটি দল নিয়ে মদিনা অভিমুখে যাত্রা করে। ইতোমধ্যে আবু সুফিয়ান তার গতিপথ পরিবর্তন করে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সে কুরাইশদের নিকট খবর পাঠায়, সে নিরাপদে আছে এবং তারাও যেন

সৈন্যদল নিয়ে ফিরে আসে। সৈন্যদলে থাকা অধিকাংশ লোকই ফিরে যেতে সম্মত হয়; তবে বেঁকে বসে আবু জাহেল। সে মুসলমানদের জব্দ করতে চাইল, যাতে করে তারা ভবিষ্যতে আর কখনো তাদের কাফেলাকে বাধাগ্রস্ত করতে না পারে।

দ্বিপাক্ষিক এই যুদ্ধটি ছিল একটি অসম লড়াই। যেখানে মুসলমানের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৩০০, কুরাইশদের সৈন্য ছিল সেখানে এক হাজারেরও বেশি। মুসলমানদের জন্য এটি ছিল প্রথম যুদ্ধ। যুদ্ধের পুরোটা সময় জুড়েই নবিজি দুআ করছিলেন পরম রবের দরবারে। বলছিলেন—'হে আল্লাহ! মুসলমানদের এই দলটি যদি আজ পরাজিত হয়ে যায়, তাহলে দুনিয়ার বুকে আপনার ইবাদত করার মতো আর কোনো মানুষ বাকি থাকবে না।'

তিনি ক্রমাগত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেই যাচ্ছিলেন। একপর্যায়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে সহযোগিতার আশ্বাস এলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে—

> 'আর স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন—"নিশ্চয় আমি তোমাদের পরপর আগমনকারী এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করছি।"' সূরা আনফাল : ৯

এ ছাড়াও একাধিক হাদিসে পাওয়া যায়, ফেরেশতাগণ সরাসরি অবতরণ করে অংশ নিয়েছিলেন জিহাদের ময়দানে। ধীরে ধীরে সাহস হারাতে শুরু করে শত্রুবাহিনী এবং একপর্যায়ে সহযোগীশূন্য অবস্থায় নিহত হয় আবু জাহেল। এটি নিঃসন্দেহে মুসলমানদের জন্য একটি গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ের অধ্যায় রচনা করেছিল। এই অসম যুদ্ধে মাত্র ১৪ জন মুসলমান শহিদ হয়েছিলেন, যেখানে শত্রুবাহিনীর নিহতের সংখ্যা ছিল ৭০ জন। সমসংখ্যক লোককে আটক করা হয়েছিল যুদ্ধবন্দি হিসেবে। বদর যুদ্ধের এই সফলতা নবিজির সামরিক নেতৃত্বে এক নতুন মাত্রা যোগ করে, বিপুলসংখ্যক লোককে উদ্‌বুদ্ধ করে ইসলামের ছায়াতলে আসতে।

উহুদের যুদ্ধ, শাওয়াল, তৃতীয় হিজরি (মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

বদর ও উহুদ যুদ্ধের মাঝখানে দুই বছরেরও কম সময়ের একটি যুদ্ধবিরতি ছিল। কুরাইশদের জন্য বদর যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি হজম করা সহজ ছিল না। তাই তারা মুসলমানদের ওপর আরও ভয়ানক আক্রমণ চালানোর জন্য নতুন করে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। তারা পার্শ্ববর্তী সকল গোত্রকে আমন্ত্রণ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে। পরিকল্পনা ছিল, সবাই মিলে একযোগে আক্রমণ করে নবগঠিত ইসলামি রাষ্ট্রকে ধূলিসাৎ করে দেবে। একপর্যায়ে তারা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৩০০০ লোকের এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে। মুসলমানরা সিদ্ধান্ত নেয়, শত্রুবাহিনীর মোকাবিলা করবে মদিনা শহরের বাইরে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শত্রুদলের একদম মুখোমুখি, তখন মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাই মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে। সে তার ৩০০ জন অনুসারী নিয়ে কেটে পড়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে।

কুরাইশরা তাদের শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে খুবই সর্তকতা অবলম্বন করে। একপর্যায়ে উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এতে মুসলমানগণ তাঁদের অনেক সাহসী যোদ্ধা হারান। নবিজির চাচা হামজা (রা.) অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একসময় তিনি একটি অন্ধকার পরিবেশে শত্রু কর্তৃক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শাহাদাতবরণ করেন। হামজা (রা.) ও মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর মতো বীর সাহাবিদের হারিয়ে ফেলেও দাপটের সাথে লড়াই করে যাচ্ছিল মুসলিম মুজাহিদগণ। বিজয়ের পথেই হাঁটছিলেন তাঁরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বনির্ধারিত তিরন্দাজ বাহিনীর একটি ভুলের কারণে যুদ্ধে বিজয়ের কাঁটা ঘুরে যায়। এতে করে অবস্থা এতটাই সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে, একপর্যায়ে শত্রুবাহিনী সরাসরি আক্রমণ করে বসে স্বয়ং নবিজির ওপর। তারা চারপাশ থেকে মুসলমানদের ঘিরে ফেলে। নবিজি চারপাশে মাত্র নয়জন মুসলমান যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই নয়জন সাহাবির সাহসিকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা শত্রুপক্ষ থেকে আসা সকল আক্রমণ নিজেদের শরীরে গ্রহণ করছিলেন ঢালের মতো। কিন্তু সেই নয়জন সাহাবির মধ্য থেকে একে একে সাতজনই শহিদ হয়ে যান।

এহেন সংকটময় মুহূর্তে উম্মে আম্মারা (রা.) নামে একজন মহিলা সাহাবি তাঁর শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে নবিজির জন্য ঢালস্বরূপ দাঁড়িয়ে যান। শত্রুবাহিনী যখন আক্রমণ করতে করতে নবিজির একেবারে কাছে পৌঁছে যায়, তখন সেই মহিলা সাহাবি তাদের সকল আঘাত নিজের শরীরে গ্রহণ করে নেয়। এতে তাঁর শরীরের ১২ জায়গায় ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং তিনি চিরতরে একটি হাত হারান। এটি নবিজি ﷺ-এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের অতুলনীয় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

এই যুদ্ধে নবিজি মারাত্মকভাবে আহত হন। আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবিজির সামনের দিকে ওপর ও নিচের পাটির কয়েকটি দাঁত ভেঙে যায় এবং শত্রুর আক্রমণে আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাঁর মাথার খুলি। যুদ্ধের ময়দানে বারবার চেহারা থেকে বেয়ে আসা রক্ত মুছছিলেন তিনি। ইতোমধ্যে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শহিদ হয়ে গেছেন। এই গুজব শুনে কুরাইশরা ফিরে যেতে সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ফিরে যাওয়ার সময় তারা বুঝতে পারে, এটি একটি গুজব ছিল এবং মুহাম্মাদ ﷺ এখনও বেঁচে আছেন। আবু সুফিয়ান তখন চিৎকার করে বলে, আগামী বছর আবারও দেখা হবে বদরের প্রান্তরে।

আহজাবের যুদ্ধ, শাওয়াল ও জিলকদ, পঞ্চম হিজরি (৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় দেখে অনেকেই মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে সমরবিদ্যায় অপারদর্শী মনে করতে শুরু করে। এতে পার্শ্ববর্তী ইহুদি গোত্রগুলো এবং কিছু কিছু মুনাফিক প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরোধিতা শুরু করে। বনু আসাদ গোত্র তো সরাসরি মদিনায় আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। এই গোত্রকে ঠেকাতে নবিজি আবু সালামা (রা.)-এর নেতৃত্বে দেড়শত

মুসলমানের একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। মুসলমানদের যুদ্ধপ্রস্তুতি দেখে বনু আসাদ গোত্রের সৈন্যরা হতবাক হয়ে যায় এবং মাল-সামানা রেখেই পালিয়ে যায় তারা। এরপর মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যা করার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় বনু নাজির গোত্র। রাসূল ﷺ এ কথা জানতে পেরে ১০ দিনের মধ্যে তাদেরকে আবাসস্থল পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ জারি করেন। ফলে তাদের বাগান-উদ্যান এবং অন্য সব সম্পত্তি মুসলমানদের করায়ত্তে চলে আসে। মুসলমানদের অভিযানে মদিনা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় বনি গাতফান নামের আরও একটি গোত্র।

এসব বিদ্রোহী গোত্রকে সমূলে নির্মূল করার ক্ষমতা নবিজির ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি; বরং মদিনা থেকে বিতাড়িত করে তাদের বিরুদ্ধে সাময়িক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তিনি। বাস্তুচ্যুত হয়ে এসব গোত্রের মধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে। কারণ, মুসলমানরা তাদেরকে বাসস্থান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, অধিগ্রহণ করেছে তাদের সমুদয় সম্পত্তি। ফলে মুসলমানদের আক্রমণ করার লক্ষ্যে কুরাইশদের সাথে জোটবদ্ধ হয় তারা। এদিকে মুসলমানদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য কুরাইশরাও ছিল মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায়। একপর্যায়ে তারা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাত্রা করল মদিনার অভিমুখে। তাদের সম্মিলিত সৈন্যসংখ্যা গিয়ে ঠেকে ১০ হাজারে। এই বিশাল সৈন্যবাহিনী যদি মুসলমানদের ওপর অতর্কিত হামলা করত, তাহলে মুসলমানদের পক্ষে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই হয়ে উঠত মারাত্মক কঠিন।